بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করছি। মাননীয় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি মি. লাক্ষমানান-এর অনুমোদন সাপেক্ষে এ অনুষ্ঠানটি আরম্ভ করছি। মি. লাক্ষমানান, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ এ অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হলো এমন একজন লোকের কাছ থেকে সকল অমুসলিম বন্ধুদের ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ করে দেয়া, যিনি এ বিষয়ে দক্ষ এবং প্রচুর জ্ঞান রাখেন। যিনি মস্তক থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করে ইসলাম সম্পর্কে নতুনভাবে জানতে শেখান। আমাদের অদ্যকার সন্ধ্যার সম্মানিত আলোচক হলেন মুম্বাই থেকে আগত ডা. জাকির নায়েক। তিনি একজন ডাক্তার এবং চিকিৎসাজীবী। কয়েক বছর যাবৎ ডা. জাকির নায়েক ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার জন্যে এবং তা মানুষের মাঝে পৌঁছে দেয়ার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন।

তিনি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করে থাকেন। তাঁর টেপ, সিডি, ক্যাসেট বিশ্বব্যাপী প্রচুর চাহিদাও রয়েছে। তিনি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন অব মুম্বাইর প্রতিষ্ঠাতা। যে প্রতিষ্ঠানটি ইসলামের সঠিক জ্ঞানকে মুসলিম আর অমুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে সব ভ্রান্ত ধারণা মুসলিম এবং অমুসলিমদের পারস্পরিক সৌহার্দ ভেঙ্গে দিচ্ছিল এবং তা প্রসার লাভ করছিল, সেসব ভ্রান্ত ধারণা ও মিথ্যা উপলব্ধিকে দূরীভূত করেছেন। অদ্য এই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানটি যেভাবে পরিচালিত হবে তা হল, প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করবেন মাস্টার কাবিল আব্দুল্লাহ। এরপর মাননীয় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি মি. লাক্ষমানান আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন। এরপর বক্তব্য রাখবেন ভাই মোহাম্মদ আব্দুল আলী এবং সর্বশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি ডা. জাকির নায়েক। বক্তব্যের প্রারম্ভে আয়োজকদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। এখন থেকে অনুষ্ঠান তার নিজস্ব গতিতে চলবে। এ পর্যায়ে সম্মানিত প্রেসিডেন্টের অনুমতিক্রমে মাস্টার কাবিল আব্দুল্লাহকে কুরআন মাজীদ থেকে তিলাওয়াত করার জন্য আহ্বান করছি।

এখন আমি মাদরাস হাইকোর্টের সম্মানিত বিচারপতি তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

ধন্যবাদ, নবাব মোহাম্মদ আলী। ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন অব মুম্বাই এর সভাপতি ডা. জাকির নায়েক। মি. মাহমুদ আব্দুল্লাহ বাদশা, মি. নিজাম এ হরিস, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর মি. ফয়জুর রহমান, অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ। বক্তব্যের প্রারম্ভেই আমাকে এ ধরনের একটি মহতী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের মধ্যে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে আয়োজকদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী আমাদের আচার ও ব্যবহার ইহজাগতিক। ৩ জানুয়ারি ১৯৯৭ সালে আমাদের দেশের সংবিধানের ৪৩ তম সংশোধনীতে ইহজাগতিক শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়। ইহবাদ বা ইহজাগতিকতা আমাদেরকে

সকল বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শনের কথা উল্লেখ রয়েছে। ভারতের সংবিধানে এটি উল্লেখ আছে বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন নাগরিক বৈষেম্যের স্বীকার হবে না। সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদে ধর্মের ভিত্তিতে, ধর্মের অধিকারে সংখ্যালঘুদের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৫ এ বিশ্বাসের অধিকার এবং তা প্রচার ও বিস্তারের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের দেশের সংবিধান সাম্য, একতা ও ধর্মীয় শান্তির ধারণা অনুমোদন হয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এ ধরনের অনুষ্ঠান পারস্পরিক সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রাখবে। এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রতি মানুষের উৎসাহ রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করবে। শেষ করার পূর্বে আমি আবারো এই সন্ধ্যায় আপনাদের মধ্যে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্যে আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমি যখন আমার কর্মশালায় নিয়োজিত ছিলাম নবাব মোহাম্মদ আব্দুল আলী আমাকে আমন্ত্রণ জানালে আমি সাথে সাথে সম্মত হই। তিনি আমাকে বলেন, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর আলোকপাত করবেন। সকালেই আমি বলেছিলাম ৮ টায় আমার আরও একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের কথা দেয়া আছে সুতরাং এই আলোচনাটি শ্রবণ করা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হতে হল।

ডা. জাকির নায়েক, আমার বন্ধু ফয়জুর রহমান এবং আমাদের নবাব মোহাম্মদ আব্দুল আলী আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে সময় দিতে পারছি না। যাহোক, আমি অদ্যকার এ সন্ধ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বক্তা ডা. জাকির নায়েককে ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব শীর্ষক বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানাচ্ছি এবং একই সাথে এই বক্তব্যের একটি অডিও ক্যাসেট আমাকে প্রদান করার অনুরোধ জানাচ্ছি। যার ফলে পরবর্তীতে আমি বক্তব্যটি জ্ঞাত হই এবং আমার মতামত জানাতে পারি। একথা বলে এখানে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

আমরা বিচারপতি মি. লাক্ষমানানকে তার উদ্দীপনামূলক ও অন্তর্জ্ঞানসম্পন্ন বক্তব্য প্রদানের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যা আমাদের ভাবনা ও চিন্তাকে সুদূর প্রসারিত করবে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে আমি সকল মুসলমান ভাইদের সহযোগিতা করার জন্যে অনুরোধ জানাই এবং সাথে সাথে অমুসলিম বন্ধু ও অতিথিদের আসন গ্রহণ করার সুযোগ দেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এ আলোচনাটি মূলত অমুসলিম ভাইদের জন্য সুতরাং আমাদের অমুসলিম ভাইরা যেন ঠিক মতো বসে আরামের সাথে আলোচনা শুনতে পারেন সহযোগিতা করতে পারেন সে দিকে সকলকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অদ্যকার এ সান্ধ্যকালীন আলোচনা সভার উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় অন্তর্জ্ঞান প্রসার করা। ভারত এমন একটি দেশ যেখানে সকল ধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাসের বিভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস করে। একজন আরেকজন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অবশ্যই জরুরী।

আমাদের অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য হলো অমুসলিম ভাইদের জানানো, ইসলাম প্রকৃত অর্থে বলছে কী, ইসলাম বিশ্বাস করে কী। কেন তারা ইসলামকে বিশ্বাস করবে। বর্তমানে তারা কী বিশ্বাস করে এবং কেন বিশ্বাস করে? তাদের কাজকর্মকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। তারা কী করছে আর কী বিশ্বাস করছে। অদ্যকার এ অনুষ্ঠানের সম্মানিত বক্তা ডা. জাকির নায়েক খুব সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের ওপর তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। তাঁর আলোচনার শেষে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে যেখানে শুধু অমুসলিম ভাইরা প্রশ্ন করতে পারবেন। একই সাথে আমি সম্মানিত বক্তা ডা. জাকির নায়েককে ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ওপর তাঁর আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

বক্তব্য রাখছেন ডা. জাকির নায়েক

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম। বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সম্মানিত বিচারপতি মি. লাক্সমানান, নবাব মুহাম্মদ আলী, ভাই ফাইয়াজ, আমার সম্মানিত বড় ভাই এবং আমার প্রাণপ্রিয় ভাই ও বোনেরা। আমি শান্তির বার্তাসহ সবাইকে সুস্বাগতম জানাই, ইসলামিক শুভেচ্ছা, আস্‌সালামু আলাইকুম। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অদ্যকার এই সন্ধ্যাকালীন আলোচনার বিষয় ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু। ইসলাম শব্দটি সালাম শব্দ থেকে আগত। এর অর্থ শান্তি। নিজের ইচ্ছাকে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পণ করে দেওয়ার নামই ইসলাম। যে ব্যক্তি পুরোপুরি নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে দেন তিনিই মুসলিম। অধিকাংশ মানুষের ভেতর ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে ইসলাম মহানবী (স) কর্তৃক প্রদত্ত একটি নতুন ধর্ম। বস্তুত মহান সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষ যখন এ পৃথিবীর বুকে পা রেখেছিলো তখনও ইসলাম বিদ্যমান ছিলো। মহানবী (স) ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নন। যদিও পবিত্র কুরআনে সূরা আল-ফাতির এ উল্লেখ করা হয়েছে–

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۔

অর্থাৎ, আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের নিকট সতর্ককারী আসেনি। সূরা ফাতির ঃ ২৪

আবার পবিত্র কুরআনে সূরা রাদ এ বর্ণিত –

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۔

অর্থাৎ, কাফেররা বলে; তাঁর পালনকর্তার তরফ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? আপনার কাজতো ভয় প্রদর্শন করা এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক পাঠানো হয়েছে। সূরা রা'দ ; ৭

পৃথিবীর বুকে যুগে যুগে দেশে দেশে নবী ও রাসূল আগমন করেছেন। যার মধ্যে মাত্র ২৫ জনের নাম পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ আদম, নূহ, মূসা, ইব্রাহিম, ঈসা, ইসমাইল, দাউদ, সোলায়মান, মুহাম্মদ (স)। যদিও পবিত্র কুরআনে ২৫ জন নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু আমাদের মহানবী (স) হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীতে ১,২৪০০০ (একলক্ষ চব্বিশ হাজার) এর উপরে নবী ও রাসূল আগমন করেছেন। তবে প্রত্যেক নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পূর্বে আগমন করেছেন এবং তারা শুধু তাদের অঞ্চলের মানুষের সেই নির্দিষ্ট সময়ের পথ নির্দেশনা দেওয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনুল মাজীদে সূরা আহযাবের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে–

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّۦنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ۔

অর্থাৎ, মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত। সূরা আহযাব; ৪০

সুতরাং কুরআন বলছে মুহাম্মদ (স) পৃথিবীতে আগত শেষ এবং সর্বশেষ নবী। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত আছে–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি। সূরা আম্বিয়া : ১০৭

পবিত্র কুরআনে আরও বর্ণিত আছে–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًاوَّ نَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আমি আপনাকে সমস্ত মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। সূরা সাবা, ২৮

সুতরাং মহানবী (স)-কে কেবল মুসলমান বা আরববাসীদের জন্যে প্রেরণ করা হয়নি। সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। অনেক অমুসলিম ইসলামকে 'মুহাম্মাদিজম' -এর সমর্থক শব্দ হিসেবে মনে করেন এবং মুসলমানদের বলেন 'মুহাম্মাদিয়ান'। 'ইসলাম' এবং 'মুহাম্মাদিজম' এক বিষয় নয়। ইসলাম ধর্ম কখনও মুহাম্মাদিজম নয়, মুহাম্মাদিজম কোন ধর্ম নয়। আমি পূর্বেও বলেছি ইসলাম হল মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম যা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে চলে আসছে। হযরত আদম (আ) হলেন প্রথম নবী এবং হযরত মুহাম্মদ (স) শেষ নবী। আর মুহাম্মাদিজম অর্থ একজন মানুষ যিনি মুহাম্মদ (স)-কে পূজা করেন। আমরা মুসলমান তাঁকে সম্মান করি, কিন্তু এখানে একজনও নেই যিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে পূজা করেন।

এটি ইসলাম ধর্মে জায়েজ নেই। সুতরাং মুহাম্মাদিজম ভুল ভাবে উপস্থাপিত একটি শব্দ। যে সকল মানুষ ইসলামকে অনুসরণ করে তারাই মুসলিম। মুসলিম ব্যক্তি যিনি তার ইচ্ছাকে মহান আল্লাহ ত'আলার নিকট সমর্পণ করেন, এবং আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী করি; অন্য কারো নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতি গোষ্ঠীর জন্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪টি মহা গ্রন্থের কথা পবিত্র কুরআন শরীফে আলোকপাত করা হয়েছে। সেগুলো হল, তাওরাত, যাবূর, ইনজিল এবং ফুরকান। এই ফুরকানই হল পবিত্র আল কুরআন। মহাগ্রন্থের মধ্যে তাওরাত মূসা (আ) উপর, যাবূর দাউদ (আ)-এর উপর এবং ইনজিল হযরত ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়। এবং পবিত্র কুরআন হল সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়। যিনি সমস্ত বিশ্বের সর্বশেষ মানুষের অগ্রদূত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। যাহোক, কুরআন মাজীদে বলা হচ্ছে– পৃথিবীর বুকে বহু কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। যেমন– সহিফা-ই ইব্রাহিম। কিন্তু এর মধ্যে ৪ খানা মহাগ্রন্থের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা রয়েছে। কুরআনের পূর্বে যে আসমানী গ্রন্থসমূহ এসেছে তার প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট কওমের জন্যে।

কিন্তু পবিত্র কুরআনে সূরা ইব্রাহিমে বর্ণিত আছে–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

অর্থাৎ, কুরআন মানুষের জন্যে একটি সংবাদনামা এবং যাতে এ দ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই একক, এবং যাতে জ্ঞানী ব্যক্তিরা চিন্তা-ভাবনা করে। সূরা ইব্রাহিম; ৫২

এছাড়া পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ـ

অর্থাৎ, রমজান মাস হল সে মাস যে মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে পবিত্র কুরআন। যা মানুষের জন্যে হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্যে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ـ

অর্থাৎ, আমি আপনার উপর সত্য ধর্মসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানবের কল্যাণরূপে। সূরা জুমার; ৪১

পবিত্র কুরআনে একমাত্র মুসলিম বা আরবদের কথা বলা হয়নি। সমগ্র বিশ্বমানবতার কথা বলা হয়েছে এবং এটা সর্বশেষ গ্রন্থ। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি রয়েছে যারা বিশ্বাস করে না পবিত্র কুরআনই শেষগ্রন্থ।

এ ব্যাপারে আল কুরআনের সূরা নিসায় বর্ণিত আছে–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ـ

অর্থাৎ, এরা কি লক্ষ করে না কুরআনের প্রতি? এটা যদি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো তরফ থেকে হতো, তবে তাতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেতো। সূরা নিসা; ৮২

ইহা কি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীর অন্য কোথাও থেকে এসেছে? যদি আসতো অবশ্যই এর ভেতর দ্বন্দ্ব থাকতো। আমি মুম্বাইতে 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী' এ বিষয়ে একটি আলোচনা করেছিলাম। যেখানে আমি প্রমাণ করেছিলাম মুসলিম এবং অমুসলিম সবাই বিশ্বাস করে কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এমন কি একজন বিধর্মী নাস্তিকও তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে মেনে নিয়েছে। কিন্তু একজন নাস্তিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না। তাহলে সে কীভাবে স্বীকার করে কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী? যদি একজন নাস্তিক যখন আমাকে ঠিক এসে বললো, 'আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না।' আমি প্রথমত, ঐ নাস্তিককে অভিনন্দন জানাই। আপনি কি জ্ঞাত? কোন কারণে সে অন্যদের মতো ভাবে না?

সকল খ্রিস্টান চিন্তা করে সে খ্রিস্টান কারণ তার বাবা মা খ্রিস্টান। সে একজন হিন্দু কারণ তার বাবা মা হিন্দু, সে একজন মুসলমান কারণ তার আব্বা মা মুসলমান। একজন নাস্তিক চিন্তা করে প্রত্যেকে তার পিতার ধর্মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। সেভাবে আমার পিতা যা বলে আল্লাহর ধারণা কি তাই? ইহা সঠিক নহে। সে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই এ কারণে সে ইসলামের প্রথম মতবাদটি অনুধাবন করতে সক্ষম হতে পেরেছেন। কালেমা তৈয়্যবা এর প্রথম অংশ হল লাইলাহা অর্থাৎ কোন মাবূদ নেই। সে ইসলামের প্রথম মত বিশ্বাসের সাথে একমত হয়েছে। এরপর অন্য অংশ বিশ্বাস করানো 'ইল্লাল্লাহু" অর্থ আল্লাহ ব্যতীত। ইসলামের মূল ভিত্তি হল 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই এবং মহানবী (স) তাঁর প্রেরিত রাসূল। যখন একজন নাস্তিক ইসলামের প্রথম মতবাদ অংশ বিশ্বাস করে তখন আমি তাকে স্বাগত জানিয়ে দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি। তা আমি অবশ্যই করতে পারব 'ইনশাআল্লাহ'। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এমন একজনকে আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে তার সম্পর্কে এমন একটি যন্ত্র রাখা হল যেটি এই পৃথিবীর কোন মানুষ ইতিপূর্বে দেখেনি, যার পরিচয় এখনও ঘটেনি, যেটি সম্পর্কে এখনও কেউ কিছু শোনে নি। এখন যদি আপনি প্রশ্ন রাখেন কে সেই লোক

যিনি এই যন্ত্রটির কার্যপ্রণালী এবং নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন? নাস্তিকরা কি ধরনের জবাব দিবে? কোন কোন নাস্তিক জবাব দিবে প্রথমে যন্ত্র সম্পর্কে সেই লোক বলতে পারবেন যিনি এটি সৃষ্টি করেছেন। কারণ, যন্ত্রটি ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি এ সম্পর্কে কিছু শোনেনি বা কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানেনা। সুতরাং কেউ বলবে শুধুমাত্র নির্মাণকারী, কেউ বলবে উৎপাদনকারী বা কেউ বলবে প্রস্তুতকারী অথবা কেউ বলবে সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারবেন। তারা যাই বলুক শুধু এটা মনে রাখা প্রয়োজন তারা একই মত দিচ্ছে। যদি নাস্তিককে জিজ্ঞাসা করা হয় কিভাবে পৃথিবী সৃষ্টি হল এ বিষয়ে বিজ্ঞান সর্বশেষ কি বলছে। তিনি আপনাকে বলবেন 'বিগব্যাং' থিউরী এর মতে সমগ্র বিশ্ব একটি নীহারিকার আকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। অতপর সেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভাজন ঘটে, যা গ্যালাক্সী, গ্রহ, চাঁদ, সূর্য এর সৃষ্টি করে বর্তমানে যার ভেতর আমরা বসবাস করছি। সার্বিকভাবে এ তত্ত্বকে বিগব্যাং থিউরি বলে। আমরা গতদিন যে বিগব্যাং থিউরি আবিষ্কার করেছি, তা কে লিখেছেন? তা আরও ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। তখন নাস্তিক ব্যক্তিটি হয়ত বলবে পারে তিনি ধারণা করে বলেছেন। কিন্তু এটা কি সম্ভব একজন প্রবল জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ এটি ধারণা করেছেন এবং তা লিখেছেন। ঠিক আছে কোন সমস্যা নেই। বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের বলছে, সৃষ্টির প্রারম্ভ পৃথিবী গ্যাসে পরিপূর্ণ একটি গ্যাস পিন্ড ছিল। এ বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে হা-মীম সূরায় বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুণ্ড তারপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়; তারা বললো আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম। সূরা হা-মীম সিজদা, ১১

সুতরাং পবিত্র কোরআন বলছে প্রথম অবস্থায় এ গ্রহটি ছিল ধোঁয়া দ্বারা পরিপূর্ণ। বর্তমানে বিজ্ঞান বলছে প্রাথমিক অবস্থায় পৃথিবী ধোঁয়া দ্বারাই পরিপূর্ণ ছিল। নাস্তিক বলতে পারে হয়ত কেউ এটা অনুমানের করে বলতে পারেন। কোন সমস্যা নেই। কিছুক্ষণ আগেও আমরা আমাদের বসবাসযোগ্য পৃথিবী নিয়ে আলোকপাত করেছি। এটা সমতল তারপরও মানুষ চলতে ভীত কারণ, সে যে কখন পড়ে যেতে পারে। আপনি নাস্তিককে জিজ্ঞেস করুন পৃথিবীর আকার কি রকম? সে খুব সহজে জবাব দিবে পৃথিবী গোল। যদি প্রশ্ন করেন, আপনি কখন থেকে অবগত হলেন? তিনি আপনাকে ৫০ বা ১০০ বছর আগের কথা বলবে। যদি তার বিজ্ঞান সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকলে তাহলে বলবে স্যার ফ্রান্সিস দেব ১৫৯৭ সালে আবিষ্কার করেন পৃথিবী গোলাকার। যখন তিনি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেন এবং প্রমাণ করেন পৃথিবী গোলাকার। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা জুমার ৫নং এবং সূরা লুকমানের ২৯ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাতকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং সূর্য ও চাঁদকে অনুগত করেছেন।

এ দিন থেকে রাত হওয়া এবং রাত থেকে দিন হওয়া একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া এবং ইহা সম্ভব যদি পৃথিবী গোলাকার হয়। পৃথিবী সমতল হলে এটি সম্ভব হত না। এর ফলে যখন তখন দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটতে থাকত। সুতরাং পৃথিবী যে গোলাকার এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন মাজীদে ১৪০০ বছর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা নাযিআতে বর্ণিত আছে–

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ـ

অর্থাৎ এরপর পৃথিবীকে তৈরি করেছেন ডিম্বাকৃতি করে। সূরা নাযিআত – ৩০

আরবি শব্দ 'দাহাহা' অর্থ প্রসারণ এবং এর মূল শব্দ দাহিয়া থেকে আগত যার অর্থ ডিম। যা কোন সাধারণ ডিমকে বুঝায় না। পৃথিবীর আকার বোঝানোর জন্য এটিকে উট পাখির ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ইহা বলের মত গোলাকার নহে। এর উপরিভাগ চেপ্টা এবং মধ্যভাগ ফাঁপা। উটপাখির ডিম যেমন উপরিভাগ চেপ্টা এবং মধ্যপানে ফাঁপা অনুরূপ। অতএব, এখন যদি আমি নাস্তিককে প্রশ্ন করি যে বিষয়টি আমরা ৩০০ থেকে ৪০০ বছর আগে জেনেছি তা পবিত্র কুরআন মাজীদে ১৪০০ বছর আগে কে বলে দিয়েছে? সে তখন বলবে সম্ভবত তোমাদের নবী খুবই বিচক্ষণ ছিল এবং সেই এটা লিখেছে। ইতিপূর্বে আমরা ধারণা করতাম চাঁদের নিজস্ব আলো রয়েছে। বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে চাঁদ আলোকিত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরা ফুরকানে উল্লেখ করা হয়েছে–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

অর্থাৎ, কল্যাণময় তিনি, যিনি নভমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য এবং দীপ্তিময় চন্দ্র। সূরা ফুরকান ৬১

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে সূর্যের নিজস্ব আলো রয়েছে কিন্তু চন্দ্রের নিজস্ব আলো নেই। চাঁদের আলোকে প্রতিফলিত বা জ্যোতির আলো বলা হয়েছে। যার অর্থ চাঁদ আলো ধার করে অথবা প্রতিফলিত আলোই চাঁদের আলোর মূল উৎস। সূর্যের আলোকে 'স্বরাজ' 'ওয়াজ' অথবা 'দুজা' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার অর্থ টর্চ বা এমন কোন বাতি যা সব সময় জ্বলছে। প্রতিটি স্থানে চাঁদের আলোকে প্রতিফলিত আলো হিসেবে বলা হয়েছে। চিন্তা করে দেখব আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় এটা গত ৫০ বা ১০০ বছর আবিষ্কার করলাম; আগে পবিত্র কুরআনে সেটি ১৪০০ বছর আগেই বলা হয়েছে। যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন জানতাম সূর্য স্থির। এটা তার কক্ষপথ পরিবর্তন করে না; যেখানে চন্দ্র ও পৃথিবী তাদের কক্ষপথ পরিবর্তন করে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে একটি আয়াত রয়েছে সূরা আল আম্বিয়ায়–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ـ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। সূরা আম্বিয়া ৩৩

সুতরাং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে চাঁদ ও সূর্য তাদের নিজস্ব কক্ষপথে চলাচল করে। আমরা সাম্প্রতিক সময়ে জানলাম বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে সূর্য তার নিজস্ব কক্ষপথে চলাচল করে। যা ১৪০০ বছর আগে কুরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এটা বলেছে কে? জবাবে নাস্তিক ব্যক্তিটি বলবে এটা সৌভাগ্য বশত আকস্মিকভাবে ঘটে গেছে।

পবিত্র কুরআনে পানি চক্র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। ১৫৮০ সালে স্যার বার্নাড পাশি পানিচক্র ব্যাখ্যা প্রদান করেন। পবিত্র কুরআনে সূরা আল জুমার-এর ২১ নং আয়াতে, সূরা আর রুম এর ২৪ নং

আয়াতসহ বিভিন্ন স্থানে কিভাবে পানিচক্র কাজ করে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। পানি কিভাবে বাষ্পে পরিণত হয়ে মেঘ যে, পানির ফোঁটায় পরিণত হয়, পৃথিবীতে বৃষ্টির ফোঁটা আকারে পতিত হয় এবং সমুদ্রে গমন করে। পানি চক্র সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সবিস্তারে আলোকপাত হয়েছে যা বর্তমানে আবিষ্কৃত হচ্ছে। আমরা পূর্বেই জানতে পেরেছি পৃথিবীতে দু ধরনের পানি রয়েছে লবণাক্ত এবং মিষ্টি পানি। পবিত্র কুরআনে সূরা ফুরকানে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, তিনিই সমান্তরাল দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্টি ও তৃষ্ণা নিবারক অপরটি লোনা, বিস্বাদ: উভয়ের ভেতর রয়েছে একটি অন্তরায় একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। সূরা ফুরকান, আয়াত ঃ ৫৩

অনুরূপভাবে আরও বলা হয়েছে সূরা আর রহমান-এর ১৯ এবং ২০নং আয়াতে –

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ـ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ـ

অর্থাৎ, তিনি পাশাপাশি দুই নদী বা সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের ভেতর রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করে না।

সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান বলছে মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানি সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হলেও তা মিলিত হয় না। তাদের ভেতর একটি সূক্ষ্ম দেয়াল রয়েছে। যা পবিত্র কুরআনে ১৪০০ বছর আগেই বলা হয়েছে। এখন যদি নাস্তিক ব্যক্তিকে বলা হয়, কে এটা নির্দেশ করলো? সে অস্বস্তির সঙ্গে বলবে এটাও ভাগ্যবশত ঘটে গেছে।

পবিত্র কুরআনে জীববিজ্ঞান সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হয়েছে। সূরা আম্বিয়ায় ৩০ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ـ

অর্থাৎ, আমি প্রাণবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।

একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, আমি সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। অতপর আরবের মরুভূমি যা সৃষ্টি হয়েছে পানি শূন্যতা থেকে। অর্থাৎ পানি ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি হওয়া বা বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কে এই ন্যায়সঙ্গত কথাটি বিশ্বাস করবে না। বর্তমানে আমরা জানতে সক্ষম হয়েছি আমাদের দেহের মূল কোষ সাইটোপ্লাজম প্রায় ৮০ শতাংশ পানি ধারণ করে। প্রত্যেকটি প্রাণী ৫০ থেকে ৯০ ভাগ পানি দ্বারা গঠিত।

পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত হয়েছে সব সৃষ্টিকুল পুরুষ এবং মহিলা এ দুই লিঙ্গে বিভক্ত যা সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত হচ্ছে। কুরআন উদ্ভিদবিজ্ঞানের পাশাপাশি পাখির জীবন সম্পর্কে বলছে, পিঁপড়ার, মাকড়সার এমনকি মৌমাছির জীবন প্রণালি সম্পর্কেও বলেছে যা আমরা সাম্প্রতিককালে জানতে পারছি। কোরআন মধুর ভেতর ওষুধের কথা বলেছে যা আমরা আজ আবিষ্কার করছি। কুরআন মানবসৃষ্টি সম্পর্কে বলেছে মানুষের প্রজননের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে তথ্য দেয় যা আমরা সাম্প্রতিক জানতে পারছি, এখন উদ্ভাবন করছি। ঐ নাস্তিক ব্যক্তিটির কাছে জিজ্ঞেস করি, কে এ তথ্যগুলো দিল? সে বলতে পারে না ভাগ্যক্রমে। কারণ এটি একটি তত্ত্ব যা 'সম্ভাব্যতার তত্ত্ব' নামে খ্যাত। দৈবক্রমে ঘটনা কম ঘটে যখন সে অধিক পরিমাণে ঠিক উত্তর প্রদান করে। কারণ, ভাগ্যক্রমে বারবার ঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। যেটি 'সম্ভাব্যতার তত্ত্ব' বলে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে প্রথম ঐ একটি জবাবই থাকে।

তিনি জবাবগুলো দিচ্ছেন, যিনি পৃথিবী সৃষ্টির গোপন রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত। সেই মহান সৃষ্টিকর্তা, প্রস্তুতকারী, নির্মাণকারী। আপনি তাঁকে যেকোনো নামেই ডাকুন। কিন্তু একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই রয়েছেন যাকে আমরা আল্লাহ বলি। অথবা সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলে ঘোষিত।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কীভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়? আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেটের কথা বলতে পারেন যেটি "কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান দ্বন্দ্ব ও সমাধান" নামে পরিচিত। যেখানে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলেছি। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (স) বলেন, সহীহ্ বুখারী শরীফের ২ নং হাদীস শরীফে..

ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলো ইসলামের খুঁটি তার প্রথমটি হল তাওহীদ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" যার অর্থ– 'নেই কোনো মাবুদ আল্লাহ ব্যতীত এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর প্রেরিত রাসূল।' এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারাতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, সৎকর্ম শুধু এই নয় যে পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সব নবী রাসূলের ওপর। সূরা বাকারা;; আয়াত : ১৭৭

মুসলমানের নিকট সবচেয়ে বড় পরিচয় হিসেবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সূরা ইখলাসে ঘোষণা করেছেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدًا ـ

অর্থাৎ, বলুন তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাকে কেউ জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। – সূরা ইখলাস, আয়াত ঃ ১–৪

এটাই সর্বশক্তিমান আল্লাহর বড় পরিচয়। মুসলিমরা বলে থাকে যে কোন লোক নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করে যদি সে উল্লেখিত চার লাইনের পরিচয় পূর্ণ করতে পারে তখন তাকে আল্লাহ হিসেবে মেনে নিতে মুসলিমদের কোনো প্রকার আপত্তি নেই। কিন্তু পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত আছে,

অর্থাৎ, আল্লাহ বলে ডাক কিংবা রহমান বল, যে নামেই ডাক না কেন সব সুন্দর নাম তাঁরই। সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ১১০

অর্থাৎ, আপনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে যে নামে ইচ্ছে ডাকতে পারেন; তবে তা হতে হবে সুন্দর। একটা শূন্য থেকে কিছু এনে মানুষের মন ছবিতে বসিয়ে দেয়া নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে। যেমন ঃ আর-রহমান, আর-রাহিম, আল জব্বার, আল কুদ্দুস, আল খায়ের। তিনি ক্ষমাশীল, তিনি পরোপকারী ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং নিখুঁত নাম হল আল্লাহ। এখন কেন মুসলিমরা 'গড' অপেক্ষা 'আল্লাহ' ডাকতে বেশি পছন্দ করে? কারণ, ইংরেজি শব্দ গড বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আরবি শব্দ 'আল্লাহ' বলতে এক ও অদ্বিতীয় একজনকেই বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি God এর সাথে একটা s যোগ করে দেন তাহলে দাড়ায় Gods কিন্তু ইসলামে Allahs নামে কোনো শব্দ নেই। আল্লাহর কোনো বহুবচন নেই। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা এখলাস-এর ১নং আয়াতে বলা হয়েছে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ

অর্থাৎ, বলুন, তিনি আল্লাহ, এক।

আপনি যদি God-এর সাথে ess যোগ করেন তাহলে দাঁড়ায় Godess যার অর্থ মহিলা God কিন্তু ইসলামে মহিলা আল্লাহ বা পুরুষ আল্লাহ বলে অস্তিত্ব নেই। আল্লাহর কোনো লিঙ্গ ভেদ নেই। তিনি এক। আপনি যদি God-এর পরে mother শব্দটি যোগ করেন তবে দাঁড়ায় God mother অর্থাৎ ধর্মমাতা। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষেত্রে Allah-ammi বা Allah- mother বলে কোন কিছু নেই। আপনি যদি God-এর প্রারম্ভে একটি উপসর্গ Tin ব্যবহার করেন তাতে দাঁড়ায় Tin-god অর্থাৎ, ভ্রান্ত বা জাল। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে Tin Allah বলে ইসলামে কোন কিছু নেই। তাই আমরা মুসলমানরা God (গড) এর পরিবর্তে আল্লাহ বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। আপনি তাকে যে কোনো নামেই ডাকতে পারেন। [সূরা বনী ইসরাঈল; আয়াত-১১০] এটি সূরা আরাফা-এর ১৮০ নং আয়াতে সূরা ত্বোহা এর ২০ নং এবং সূরা আল হাশরের ২৪ নং আয়াতে বর্ণিত আছে আপনি আল্লাহকে যে নামেই ডাকুন না কেন তা সর্বাপেক্ষা সুন্দর নাম। পবিত্র কুরআনে আবারো সূরা আন-আমের ১০৮ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا ـ

অর্থাৎ, তোমরা তাদেরকে খারাপ বলো না। যাদের তারা আরাধনা করে, আল্লাহ ব্যতীত; তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে খারাপ বলবে।

সুতরাং কোনো মুসলমান যদি তাদেরকে বোঝাতে যেয়ে তারা যার উপাসনা করে তাকে মন্দ বলে তবে তারাও অজ্ঞতাবশত: আল্লাহকে খারাপ বলার দৃষ্টতা দেখাবে।

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো সালাত। কেউ কেউ সালাতকে দোআ বলে থাকেন। দোআ অর্থ সাহায্যের জন্যে আবেদন, সবিনয় প্রার্থনা যেভাবে একজন লোক আদালতে নিবেদন জানিয়ে সাহায্য চায়। দোআ আরবি শব্দ সালাতের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। কারণ সালাতের মধ্যে আমরা সাহায্যের জন্যে আবেদন করি, আল্লাহর বন্দনা করি। সালাতের মধ্যে আমরা পথ নির্দেশনা পাই। সুতরাং ইংরেজি শব্দ Prayer আরবি শব্দ সালাতের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না। সালাতের অধিক গ্রহণযোগ্য অর্থ হলো Programme বা অনুষ্ঠান আমরা মুসলিমরা সালাত অনুষ্ঠান করি বা পালন করি। আমরা কোন্টা ঠিক কোনটা ভুল, কোন্গুলো ভালো, কোন্গুলো মন্দ তা জেনে পালন করি। আমরা বেআইনিভাবে সম্পদ হরণ করি না। প্রতারণা করি না। ভালো কাজ করি, প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করি ইত্যাদি। সুতরাং সবই আমরা পালন করি। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কোথায় যাচ্ছেন এবং আমি যদি বলি পালন করতে যাচ্ছি, মস্তিষ্ক ধোলাই করতে যাচ্ছি, সেটা খুবই মন্দ শোনায়। সুতরাং যদি কেউ সালাতের স্থানে Prayer বা দোআ শব্দ ব্যবহার করে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যদিও Prayer শব্দটি সালাতের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না।

সাধারণত মুসলমানরা দিনে ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগে, যাকে ফজরের সালাত বলে। যখন সূর্য মাথার ওপর যায় যোহরের সালাত পড়ে। বিকেল হওয়ার পূর্বে আসর, বিকেল শেষ হয়ে সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিব এবং সন্ধ্যার পরে ও গভীর রাতের আগে এশার ওয়াক্ত সালাত আদায়

করে। আমরা দিনে কমপক্ষে ৫ ওয়াক্ত সালাত পড়ি। ডাক্তাররা আমাদেরকে বলে সুস্বাস্থ্যের জন্য দিনে কমপক্ষে তিনবার খেতে হবে। তেমনি আত্মিক শুদ্ধতার জন্যে দিনে কমপক্ষে ৫ ওয়াক্ত সালাত পড়ার জন্যে বলা হয়েছে। যখন আমরা সালাত আদায় করতে মসজিদে ঢুকি আমরা আমাদের জুতা খুলে ঢুকি, যেটি হযরত মুসা (আ)-এর সময় থেকে চলে আসছে। পবিত্র কুরআনে সূরা ত্বোয়াহার মধ্যে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছালেন তখন আওয়াজ আসলো হে মুসা, আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় রয়েছো।

(সূরা তোয়া-হা; আয়াত ঃ ১১ ও ১২)

এ আদেশটি মুসা (আ)-কে দেয়া হয়েছিল যা আমরা মুসলিমরা অনুসরণ করি। সালাত আদায় করার জন্যে মসজিদে প্রবেশের পূর্বে আমরা জুতা খুলে ফেলি। আমরা স্বাস্থ্যসম্মত সেই মানুষ যারা তাদের উপাসনালয়কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে চাই এবং আমরা গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। আমরা জুতার মাধ্যমে আসা ময়লা ধুলা দিয়ে অপরিষ্কার করতে চাই না। পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদায় বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য ওঠো তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর পরিশেষে টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর। (সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬)

আরবিতে একে ওজু বলে। সালাতের পূর্বে ওজু করা অত্যন্ত জরুরি।

আমরা সকলেই ওজু করবো, নিজেদের নিজেরা ধৌত করবো। কারণ আমরা স্বাস্থ্যসম্মত মানুষ। এবং আমরা প্রভুর সম্মুখে দাঁড়ানোর আগে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে চাই। এটা একটা মানসিক প্রস্তুতি যে, আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সালাত আদায় করতে যাচ্ছি। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) বুখারী শরীফের ৬৯২ নং হাদিসে বলেন, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হবে তখন কাধে কাধ মিলিয়ে দাঁড়াবে।

অন্য একটি হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন তোমরা সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াও তখন এমনভাবে দাঁড়াও যেন শয়তান তোমাদের মাঝখানে এসে দণ্ডায়মান হতে না পারে। নবী করীম (স) সেই শয়তানের কথা বলেননি যাকে আপনারা ওনিডা টিভির বিজ্ঞাপনে দেখেন। আপনারা জানেন ওনিডা টিভি বিজ্ঞাপনের শয়তানের দুটো শিং একটা লেজ থাকে। নবী করীম (স) যে শয়তানের কথা উল্লেখ করেছেন যে অসংখ্য কাজ করে সব ধূলিসাৎ করে দেয়। তিনি বর্ণবাদী শয়তান। এর অর্থ এটা বিবেচনার মধ্যে না আনা যে, তুমি গরিব না ধনী, তুমি সাদা না কালো, তুমি আমেরিকা, চীন ভারত না পাকিস্তান থেকে এসেছো। তুমি কি কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছো কিনা এটা কোনো বিষয় নয়। যখন আমরা সালাতের ভেতর একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দিনে পাঁচবার দণ্ডায়মান হই তখন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের চেয়ে বড় উদাহরণ কী হতে পারে। সে ধনী না গরিব পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে এসেছে এগুলো যখন আমরা দেখি না তখন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এটাই সবচেয়ে বড় ও গ্রহণযোগ্য বাস্তব উদাহরণ। সুতরাং বর্ণবাদী গোত্রবাদী, সম্পদ সমৃদ্ধ শয়তান মুসলমানের ভাইয়ের ভেতর আসতে পারে না।

সালাতের সবচেয়ে উত্তম অংশ হলো সিজদা, যেটি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যম। পবিত্র কুরআনে কমপক্ষে ৯২ জায়গায় সিজদা করার কথা বর্ণিত আছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা বলেন, শরীর আমাদের নিয়ন্ত্রণে কিন্তু আমাদের মন স্থির নয় ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে দেহকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এবং আমরা

মুসলমানরা যে সালাত আদায় করি এটাই এজন্যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আমরা দেহের সবচেয়ে উপরের অংশ অর্থাৎ কপালকে সবচেয়ে নিম্নভাগ মাটিতে স্পর্শ করি এবং বলে থাকি সব প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি মহান, প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি সবচেয়ে বড়। এবং যদি আপনি ব্যাখ্যা করে দেখবেন যখন আমরা সালাত আদায় করি আমাদের মস্তক থেকে সারাদিন যে তড়িৎ বের হতে থাকে সিজদার সময় সেই শক্তিটি মাটিকে স্পর্শ করে। আমাদের সম্মুখ ভাগ অর্থাৎ কপাল মাটিতে স্পর্শ করানোর মাধ্যমে। আমাদের তিন মাথাওয়ালা প্লাগ এবং দুই মাথাওয়ালা প্লাগ রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আপনি মাথার নিচের দিকে হাত রাখলে শট করবে। দুই হাত এবং মাথার সমন্বয়ে তিন জিন ওয়ালা প্লাগের সৃষ্টি হয়। এটা বিদ্যুৎতাড়িত হওয়ার বিষয় নয় কিন্তু এটা সম্মুখভাগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়। স্বাভাবিকভাবে আপনি যখন থাকেন, তখন সোজা হয়ে থাকেন। হৃদপিণ্ড ব্রেইনে রক্ত সঞ্চালন করে কিন্তু একটি স্বাস্থ্যসম্মত মস্তকের জন্যে তা যথেষ্ট নয়। সুতরাং যখন আপনি সিজদাতে যান অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত আপনার মস্তকে প্রবেশ করে যা মস্তকের বল বৃদ্ধি করে।

একটি অধিক ক্ষমতাধর মস্তকের জন্যে এই অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালন অত্যাবশ্যক। যখন আমরা সিজদা করি আমাদের মুখের চামড়ায় অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালিত হয় যা আমাদের মুখমণ্ডলকে সতেজ ও সুন্দর রাখে। যখন আমরা সিজদা করি তা আমাদের সাইনোসিস-এর সমস্যা সমাধান করে। অ্যাজমা সংক্রান্ত সাইনোসিসহ অন্য সব ধরণের সাইনোসিস থেকে মুক্তি পাই। একজন নামাজি লোকের সাইনোসিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিকভাবে আপনি যখন শ্বাস গ্রহণ করেন আপনার ফুসফুসের ধারণক্ষমতার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহৃত হয়। বাকি এক-তৃতীয়াংশ থেকে যায়। যখন আপনি সিজদা করেন অধিক পরিমাণে মুক্ত বাতাস আপনার ফুসফুসে প্রবেশ করে যা ফুসফুসে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়। যখন আপনি সিজদা করেন ব্রঙ্কাল ট্রি-এর ক্ষরণ হয় যার ফলে ব্রঙ্কাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। আপনি যখন সিজদা করেন ভেনাস খুব দ্রুত তলপেটের দিকে ধাবিত হয়।

এছাড়াও আরো কিছু সুযোগ সুবিধা রয়েছে। যখন আপনি কিয়াম, রুকু, সিজদা করতে গিয়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়ান, আপনার কলফ এর পেশিগুলো কর্মক্ষমতা পায় কলফ পেশি বলতে হৃদপিণ্ডের প্রান্তিক অংশের পেশিকে বোঝায় যা দেহের নিম্নভাগে রক্ত সঞ্চালন করে। সুতরাং যখন আপনি কিয়াম, রুকু, সিজদা করেন আপনার কল্‌ফ-এর পেশীগুলো কার্যকর হয়ে দেহের নিম্নভাগের পর্যাপ্ত রক্ত সঞ্চালন করে। যখন উঠে দাঁড়ান আবার কিছুটা নিচু হন আপনার মেরুদণ্ডের ব্যায়াম হয়ে যায়। যার ফলে মেরুদণ্ডের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। যদি আপনি শুধু সালাত নিয়ে কথা বলেন সালাতের অনেক চিকিৎসীয় গুণ রয়েছে। কিন্তু আমরা মুসলিমরা চিকিৎসীয় গুণের জন্যে সালাত আদায় করি না। এগুলো হলো পার্শ্ববর্তী লক্ষ্য। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহর প্রশংসা করা, এটাই আমাদের প্রধান বিরিয়ানি। চিকিৎসীয় সুবিধা হলো আমাদের পাশের গামলার খাবার। চিকিৎসীয় সুবিধার খাতিরে একজন অমুসলিম সালাত আদায় করতে পারে। সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আমরা মুসলিমরা সালাত আদায় করি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। তাঁর গুণগান গাওয়া আমাদের প্রধান খাবার বিরিয়ানি। এটা সালাতের সাথে অতিরিক্ত সুবিধা যা আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন।

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হলো যাকাত। 'যাকাত' আরবি শব্দ অর্থ পরিশুদ্ধিকরণ বা অর্থ বৃদ্ধি। ইসলামে যে ব্যক্তির নিসাব পরিমাণে অর্থাৎ কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ মওজুদ থাকবে বা সমপরিমাণ টাকা গচ্ছিত

থাকবে তার জন্যে যাকাত ফরজ। সে শতকরা ২.৫ (আড়াই) টাকা দান করে দিবে। এ দানের প্রকার সম্পর্কে সূরা তওবা-এ বর্ণিত আছে–

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ـ

অর্থাৎ, যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকীন যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন তাদেরকে এবং দাস-মুক্তির জন্যে ঋণীদের জন্য আল্লাহর পথে জিহাদীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য এই হলো আল্লাহ নির্ধারিত বিধান। (সূরা তওবা; আয়াত ঃ ৬০)

আট ধরণের ব্যক্তিই যাকাত পাবে। যাকাত প্রদান করা প্রত্যেক মুসলিম ধনবান ব্যক্তির জন্য ফরজ। যদি তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে প্রত্যেক চন্দ্র বছরে তার অর্জিত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ করে দিবে। যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি ব্যক্তিই তার জমাকৃত সম্পদের শতকরা ২.৫ ভাগ যাকাত প্রদান করতো তাহলে পৃথিবী আজ দারিদ্র মুক্ত থাকতো। একটি ব্যক্তিও না খেয়ে মৃত্যুবরণ করত না। এজন্যে পবিত্র কুরআনের সূরা হাশরে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, আল্লাহ জনপদবাসীর নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর রাসূলের তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে। যাতে ধন ঐশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না হয়। সূরা হাশর; আয়াত ঃ ০৭

পবিত্র কুরআনে সূরা তওবা-এর ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে আর তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিও। জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাটে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। সেদিন বলা হবে এগুলো তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে সুতরাং এখন স্বাদ উপভোগ কর।

সম্পদ কুক্ষিগত করাকে পবিত্র কুরআনে নিষেধ করে দিয়েছেন। আপনি সম্পদ কুক্ষিগত করা থেকে বিরত থাকুন।

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ হলো হজ্জ। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক আর্থিকভাবে সামর্থ্য মুসলমানের জন্যে পবিত্র মক্কা শরীফে গিয়ে জীবনে অন্তত একবার হজ্জ পালন করা ফরজ। এবং আমি বলতে চাই হজ্জ হলো বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় নিদর্শন। হজ্জ-এর সময় প্রায় ২.৫ মিলিয়ন (২৫ লাখ) মানুষ মক্কায়, মিনায়, আরাফায় পরিভ্রমণ করে। ২৫ লাখ মুসলমান বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে সমবেত হয়, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের প্রতিটি এলাকা থেকে। সব মানুষ দুই খণ্ড সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে হজ্জ পালন করে। আপনার পক্ষে সেখানে এটি নির্ণয় করা সম্ভব না যে, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে কি একজন রাজা না প্রজা। আপনার জানা সম্ভব নয় সে ধনী না গরিব। অন্তত তারা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হিসেবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হজ্জ পালন করছে। আমি পবিত্র কুরআনের সূরা আল হুজরাত-এর ১৩ নং আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলাম সেখানে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন–

অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের এক পুরুষ ও একক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা পরস্পরের পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সবকিছু জানেন। সূরা হুজরাত; আয়াত ঃ ১৩

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, সকল মানবজাতি একজন নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের ভিন্ন দেশ ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং তারা একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করবে। তারা কখনো একে অপরকে ঘৃণা বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারে না। আমি সর্বোৎকৃষ্ট অথবা তুমি আমার চেয়ে নিম্ন এ ধরনের কথা বলবে না। এ সম্পর্কে নবী করীম (স) বলেন, "কোনো আরব কোনো অনারব চেয়ে বড় নয় আবার কোনো অনারব আরবদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গের থেকে বড় নয়। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের থেকে বড় নয়। পবিত্র কুরআনে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে সেই সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত যে পরহেযগার, লিঙ্গ, বর্ণ, গোত্র বা সম্পদে যে শ্রেষ্ঠ সে নয়। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তিনি সবকিছুর সংবাদ রাখেন। এটা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত দিক নির্দেশনা।

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হলো সিয়াম। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম অবশ্যই সাওম পালন করবে। রমজানের পুরো চন্দ্রমাস জুড়ে সূর্য উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থেকে সিয়াম পালন করবে। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় বর্ণিত আছে–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরজ করা হয়েছে। যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের ওপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারো। সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ১৮৩

পবিত্র কুরআনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সাওম পালন করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা বলছে, যদি তুমি তোমার ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো, তুমি তোমার সব আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। পবিত্র কুরআনে এ কথাই বর্ণিত আছে যে, রমজান মানুষকে নিজের নিয়ন্ত্রণ হতে শেখায়। সব কাম, লালসা, লোভ থেকে নিজেকে দূরে রাখে। এছাড়াও বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মদ পান থেকে বিরত থাকতে পারে সে খুব ভালোভাবেই দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মদ পান না করে থাকতে পারবে। যদি কেউ সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ধূমপান না করে থাকতে পারে যে সব সময় ধূমপান না করে থাকতে পারবে। নিজেকে সংশোধন করে নেয়ার এটি একটি অন্যতম সুযোগ। আমি এটিকে আত্মসমর্পণ বা আত্মশুদ্ধি বলি। যেভাবে আপনার ব্যবহৃত যন্ত্রগুলো মেরামত করা হয় যেমন আপনি আপনার গাড়ি প্রতি তিনমাস অন্তর বা চারমাস অন্তর পরিষ্কার করেন, মোটরগাড়ি পরিষ্কার করেন ৫ মাস অন্তর। তেমনি আপনি নিজেকে যদি যন্ত্রের সাথে তুলনা করতে দেন আমি বলবো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সাবলীল যন্ত্র হলো মানুষের দেহ। রমজান হল মানুষের দেহের পরিশুদ্ধির প্রত্যেক চন্দ্র বছরের এক চন্দ্রমাস। রমজান পালনে সালাতের চেয়ে আরো বেশি চিকিৎসীয় উপকার রয়েছে। কিন্তু যখন আপনি সাওম পালন করেন সেটা আপনার হজম শক্তিকে বৃদ্ধি করে।

এটি ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র। যদি আপনি স্মরণ করেন মহানবী (স) বলেন, ইসলামের ৫টি মূলনীতি রয়েছে; পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে। অনেকে ভুল বোঝে যে, তারা এই ৫টি করতে পেরেছে সুতরাং তারা খুব ভালো মুসলমান। এটা হচ্ছে কেবল ৫টি স্তম্ভ। একজন প্রকৌশলী বলে থাকে যদি খুঁটি মজবুত হয় তবে সম্ভবত কাঠামোও মজবুত হবে। যদি ভিত্তি শক্তিশালী হয় তবে ঘরের কাঠামোও শক্তিশালী হবে। সুতরাং যদি আমরা ৫টি খুঁটি যথাযথভাবে পালন করি ইনশাল্লাহ আমাদের কাঠামো সঠিক থাকবে। এবং অন্যান্য ব্যাপারে কী করা হবে, কী করতে হবে না সেটি পবিত্র কুরআনে খুব স্পষ্টভাবেই রয়েছে। কীভাবে একজন মুসলমান তার জীবন প্রণালী পরিচালনা করবে। পবিত্র কুরআনে সূরা আল যারিয়াত-এর ৫৬ নং আয়াতে বর্ণিত আছে−

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ۔

অর্থাৎ, আমার ইবাদত করার জন্যে আমি মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা মানুষ এবং জিন জাতিকে শুধু তার উপাসনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইবাদত আরবি শব্দ এর মূল অর্থ কী? ইবাদত শব্দটি এসেছে মূল আরবি শব্দ 'আবদ' থেকে যার অর্থ 'হুকুম পালনকারী'। অনেক মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে ইবাদত বলতে শুধু সালাতকে বোঝায়। কিন্তু ইবাদত বলতে শুধু সালাতকে বোঝায় না। সালাত ইবাদতের অন্যতম একটি মূল অংশ। আল্লাহ তা'আলা যা নির্দেশ করেছেন সেটি করার নামই ইবাদত। যদি তুমি মদের মতো খাদ্য গ্রহণ ছেড়ে দাও এটাই এক ধরনের ইবাদত। কারণ পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদা-এর ৯০ নং আয়াতে বর্ণিত আছে−

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ۔

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কর্ম ব্যতীত কিছুই নয়।

যদি তুমি তোমার ব্যবসা বাণিজ্যে সৎ থাকো, তবে তুমি ইবাদত করছো। তুমি আল্লাহর গুণাগুণ করছো। তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো, তোমার জন্য বড় ইবাদতস্বরূপ। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে−

প্রতিবেশীর প্রয়োজনে সাহায্য করো। সূরা আল মাউন

যদি তুমি পরনিন্দা থেকে নিজেকে দূরে রাখো, কারো অবর্তমানে তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলা বাদ রাখো তবে তুমি ইবাদত করছো। আল্লাহর গুণকীর্তন করছো। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে−

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔

অর্থাৎ, প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ রয়েছে। [সূরা হুমাযাহ, আয়াত ঃ ১]

পবিত্র কুরআনে সূরা হুজুরাত-এর ১১ ও ১২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে−

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরকে উপহাস করো না। কোন মহিলাও অপর মহিলাকে উপহাস করবেনা, হতে পারে উপহাসকৃতরা উপহাসকারীদের থেকে উত্তম হবে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে খারাপ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে খারাপ নামে ডাকা

অন্যায়। তোমরা কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা করবে না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে ?

একে মূলত কী বুঝায়? মৃত মাংস ভক্ষণ করা ইসলামে হারাম। মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া দ্বিগুণ গোনাহ। এমনকি কোন ব্যক্তি যেসব পশুপাখি ভক্ষণ করে, তারাও তাদের মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করে না। সুতরাং কুরআন বলছে যদি তুমি পরনিন্দা করো, অগোচরে তার সম্বন্ধে মন্দ কথা বল তা তোমার জন্যে দ্বিগুণ গোনাহ, কারণ সে নিজেকে সমর্থন করার সুযোগ পায় নাই। তাই কুরআন বলছে যদি তুমি পরনিন্দা কর, তুমি কি তোমার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে তৈরি আছো? এবং আল্লাহ তার উত্তর দিচ্ছেন অবশ্যই না। তুমি এটি বর্জন কর। সুতরাং তুমি যদি পরনিন্দা না কর এটাও আল্লাহর গুণগান করা, আল্লাহর আদেশ মেনে নেয়া সুতরাং তা ইবাদত। পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, তোমার পালনকর্তা আদেশ করছেন যে তাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। যদি তাদের কেউ বা উভয়ে তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদের উদ্দেশ্য 'উহ্' বল না, তাদেরকে ধমক দিওনা। তাদের সাথে নম্রতার সাথে কথা বল, তাদের প্রতি দয়ার বাহু অবনত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি সেরূপ দয়া কর যেরূপ আমার শিশুকালে তারা আমার প্রতি দয়া করেছেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেছেন ঃ তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে কথা বলো না এবং তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে ক্ষমা চাও এই বলে যে, হে আল্লাহ! তারা আমাকে বাল্যকালে যেমন আগলে রেখেছিলেন তুমি যেন তাদেরকে ঐভাবে রাখো।

তুমি তোমার পিতা-মাতাকে আদর-যত্ন কর তাদের সম্মান করো তবে তুমি মহান আল্লাহর গুণগান করছো। সন্ন্যাসবাদ, কৌমার্যব্রত ইসলামে স্থান নেই। সহীহ বুখারীর ৭নং অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৪নং হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

"যুবকরা তোমাদের মধ্যে যাদেরই বিয়ে করার ক্ষেত্রে সামর্থ্য আছে তাদের বিয়ে করে ফেলা উচিত। এটা তোমার দৃষ্টিকে সংযত করার সাহায্য করবে এবং তোমার ভদ্রতা বজায় থাকবে।" মহানবী (স) আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।

বিবাহ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জরুরি। সুতরাং যদি আপনি বিবাহ করেন তবে তা আল্লাহ তাআলার ইবাদত হিসেবে গণ্য। আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করেন এবং স্ত্রী ব্যতীত অন্য ব্যক্তির সাথে স্বেচ্ছায় দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকেন তবে আপনি আল্লাহর ইবাদত করছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ۔

অর্থাৎ, আর ব্যভিচারের কাছে যেও না; নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। সূরা বনী ইসরাঈল; আয়াত ঃ ৩২

সুতরাং আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করেন এবং ব্যভিচার না করেন তবে আপনি ইবাদত করছেন।

পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে বর্ণিত আছে,

অর্থাৎ, মহিলাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ তাআলা অনেক কল্যাণ রেখেছেন। সূরা নিসা; ৯৯

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে আপনি অবশ্যই তাকে ভালোবাসেন এবং সমান অধিকার প্রদান করবেন। আপনি যদি সংযত পোশাক পরিধান করেন এটাই ইবাদত এটাই মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা। সংক্ষেপে আল্লাহ প্রদত্ত যেকোনো আদেশ মেনে চলাই আল্লাহকে গভীরভাবে মান্য করা। তুমি যদি সেই সব কাজ থেকে নিবৃত থাকো যা আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন তাহলে তুমি ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে। ইসলাম আমাদের জীবনে দু ভাবে ভূমিকা রাখছে; প্রথমত, এটা দেহের যত্ন নিতে সাহায্য করছে অপরদিকে আত্মা পবিত্র করছে। ইসলামে এমন কোনো বিষয় নেই যা মানুষের উপকারের পরিপন্থী। মানুষ তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ভাবতে পারে ইসলামের এই শিক্ষা ভ্রান্ত। তারা হয় ইসলাম সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞান রাখে অথবা পৃথিবীর পরিসংখ্যান সম্পর্কে ধারণা নেই। যার ফলে তারা চিন্তা করে ইসলামে একের অধিক বিয়ে করা জায়েজ যা একটি ভুল শিক্ষা। কিন্তু যদি ইসলাম সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান আপনার থাকে এবং বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক পরিসংখ্যান আপনার কাছে থাকে ইসলামের এমন কোনো শিক্ষা নেই যা মানুষের জন্য মন্দ। ইসলামের প্রতিটি শিক্ষা হয় দেহের জন্যে উপকারী অথবা মনের জন্যে। পবিত্র কুরআনে সূরা মুলুকে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ـ

অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন– কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ। সূরা মুলুক; ২

আপনার যে জীবনটা অতিবাহিত করছেন এটি পরকালের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। এটা একটা পরীক্ষা যার মধ্যে দিয়ে আমরা অতিবাহিত হচ্ছি। যদি তুমি ব্যর্থ হও নরকে যাবে। পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আমার যুবক ক্বারী ভাই কামালী তার কথার শুরুতে বলেছেন। তিনি সূরা আল আসর-এর ১ থেকে ৩ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন, যেখানে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন–

অর্থাৎ, কসম যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে পরস্পরকে তাগিদ করে সত্যের এবং তাগিদ করে সবরের। সূরা আল আসর; ১-৩

কোন ব্যক্তির জান্নাতে যাওয়ার চারটি বৈশিষ্ট্য। তাকে বিশ্বাসী হতে হবে, সৎকর্ম করতে হবে, পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্যের ধারণে নির্দেশ দিতে হবে; তাহলেই সে বেহেশতে যেতে পারবে। এর মধ্যে দু-একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে একজন মানুষের অবশ্যই এসব গুণ থাকা প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারহ-এর ২৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে– "(ইসলাম) ধর্মে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, ভুল পথ থেকে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে গেছে।

আপনাকে সত্য উপস্থাপন করতে হবে। ইসলাম কখনও স্বীকার করে না যে আপনি কাউকে তরবারি বা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করবেন। আপনি সত্য উপস্থাপন করুন, তিনি যদি মেনে নেন 'আলহামদুলিল্লাহ' ভালো। তিনি যদি স্বীকার না করেন বা মেনে না নেন আপনি তাকে বাধ্য করতে পারবেন না। আমি আয়োজকদের সাথে কথা বলে ঠিক করেছি যত সংক্ষেপে সম্ভব বক্তব্য পেশ করবো এবং অধিক সময় প্রশ্নোত্তর পর্বে কাটাবো। ইসলাম সম্পর্কে অনেক অমুসলিম ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও। আজকের এই অনুষ্ঠান মূলত অমুসলিম ভাইদের জন্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুতরাং আমি তাদের যেকোনো ধরনের প্রশ্ন, সেটি ভুল হোক, যত বোকার মতো প্রশ্ন হোক, অযৌক্তিক হোক অথবা আক্রমণাত্মক হোক আমি তা সাদরে গ্রহণ করবো।

আপনাদের সবাইকে স্বাগত আপনারা যেকোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন, ইসলামের যেকোনো রকম সমালোচনা করতে পারেন। কোনো সমস্যা নেই। আপনি যদি কুরআন সম্পর্কে জানেন তবে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধান করে নেয়ার এটা একটা সুযোগ। স্বাভাবিকভাবে আমি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চেয়ে প্রশ্নোত্তরকে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি, আপনার যেকোনো ধরনের প্রশ্নই হোক না কেন? কতিপয় ব্যক্তির মনে প্রশ্ন থাকে, কেন মুসলমানদের একের অধিক বিবি থাকে? কেন তারা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে না? কেন তারা খৎনা দেয়? আপনার জন্য এটা একটা সুযোগ যেকোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর জেনে নেয়ার। আমাকে বিশ্বাস করুন আমি অধৈর্য হব না। আপনারা যেকোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন। আপনি যদি মনে করেন ইসলামের এই শিক্ষা সঠিক নয়, এটা সম্পর্কে বলুন। আপনি এমনকি সমালোচনা করতে চাইলেও আমি তা গ্রহণ করবো। আমি যদিও যুবক তবুও তা গ্রহণ করবো এটাই আমার কাজ আমার কাজের ক্ষেত্র। আমি আজ আমার সন্ধ্যার বক্তব্য পবিত্র কুরআনের সূরা নাহল-এর ১২৫ নং আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে শেষ করব–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

অর্থাৎ, আপন **পালনকর্তার পথের** প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক **করুন সুন্দর পন্থায়**। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন যে, তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছেন। [ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।]

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ঃ আমি ভিয়াস, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছি। আমার প্রশ্নটি হলো, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য একটি ধারণা। তাহলে কেন সালমান রুশদীকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছে? শিয়া এবং সুন্নীদের মৌলিক মতবিশ্বাসের পার্থক্যটি ঠিক কোথায়? কোন বিষয়টি তাদেরকে অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, এ সমস্যা সমাধানের উপায় কি?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি অত্যন্ত ভালো একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ইসলাম কি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে? যদি তা করে তাহলে কেন সালমান রুশদীকে মৃত্যুর পরওয়ানা পাঠানো হলো। ভাই, এর পরিপূর্ণ উত্তর আমার ক্যাসেটে রয়েছে। যা মুম্বাইর সাংবাদিক সমিতির সাংবাদিক বিতর্ক সংগঠনের কাছে রয়েছে। দ্যা টাইমস অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস জার্নালিস্ট, মুম্বাই ইউনিট অব জার্নালিস্টে রয়েছে। বিষয়টি ছিল "ধর্মীয় মৌলবাদ কি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যে একটি বাধা"। তসলিমা নাসরীনের 'লজ্জা' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর যখন তার হত্যার হুমকি দেয়া হয় তখন এই আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সব কিছু বিস্তারিত বলা রয়েছে এবং সেই বিতর্কে একজন হিন্দু পাদ্রি, একজন খ্রিস্টান পাদ্রি, যিনি 'লজ্জা' উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন তিনি এবং ইসলামের পক্ষ থেকে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেটা একটা খুব ভালো বিতর্ক ছিল। সেখান থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার জন্য আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম। কতিপয় ব্যক্তি বলে অন্যান্য ধর্মে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। আপনি ধর্ম সম্পর্কে যে কোনো কিছু বলতে পারেন। আবার কতিপয় ব্যক্তি বলছে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটি বাধা। যখন আরেকজন বক্তা কেম্প বলেছিলেন, ইসলামে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। এটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। আমি কোনো কিছু গোপন করছি না। সংক্ষেপে, আমি বলছি যদি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন আরেকজনের সুনাম করে গুণগান করে, ইসলাম সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সম্মতি প্রদান করছে। যেহেতু সে কারও ক্ষতি করছে না এবং এটা প্রমাণিত।

পয়েন্ট নং ১ ঃ সে যেকোনো কিছু বলতে পারে যদি তা অপরের ক্ষতির কারণ না হয়।

পয়েন্ট নং ২ ঃ যদি সেটা কারও ক্ষতির কারণ হয়, এটা দুটো বিষয় প্রমাণ এবং প্রমাণ ছাড়া। যদি সেটা কারো ক্ষতির কারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ পরনিন্দা করা।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে তোমরা কেউ কাউকে ব্যঙ্গ করবে না, পরনিন্দা করবে না তাই সেটি প্রমাণিত হোক বা না হোক। শুধু অপবাদ দেয়ার জন্যে, এটা সঠিক নয়। আপনি যদি কারো বিপক্ষে প্রমাণসহ বলেন এটা গ্রহণযোগ্য আমি একটি কোম্পানিতে কাজ করি সেই কোম্পানিটি দুর্নীতিগ্রস্ত, আমি সে প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলতে চাই এ বিষয়ে ইসলাম আমাকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি সেখানে গিয়ে বলতে পারি এ কোম্পানিটি দুর্নীতি করছে, প্রমাণসহ বলতে পারি তারা মানুষকে ঠকাচ্ছে। কিন্তু আমি প্রমাণ ব্যতীত বলতে পারি না, প্রতিষ্ঠানটির প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত বা দুর্নীতিবাজ। যদি প্রমাণ ব্যতীত আমি কিছু বলি, সেটা আমার বলার অধিকার নেই। যদি আমি কোনো মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চাই, আমার কাছে অবশ্যই প্রমাণ থাকতে হবে।

ইসলাম আরও বলছে, আমি যদি কোনো মহিলা বিষয়ে কোন কিছু বলি, যেমন তার সতীত্ব নিয়ে নালিশ করি, তার শালীনতাবোধ সম্পর্কে কিছু বলি। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে আমাকে অবশ্যই চারজন সাক্ষী প্রয়োগ করতে হবে, যদি আমি তা না দেখাতে পারি তাহলে আমাকে আশি বেত্রাঘাত প্রদান করা হবে। এর অর্থ আপনি আমেরিকা, ইউরোপের মতো মেয়েদের কটুবাক্য বলে নিষ্কৃতি পেয়ে যেতে পারেন না। ইসলামে বলা হচ্ছে, আপনি যদি মেয়েদের সম্পর্কে কটুবাক্য বলেন, তাদের নামে মন্দ কিছু রটিয়ে থাকবেন আপনি যদি তা চারজন সাক্ষীসহ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন তবে আপনাকে আশি বেত্রাঘাত দেয়া হবে। আপনাকে অবশ্যই প্রতিটি অবস্থায় সাক্ষ্য প্রমাণ দেখাতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে, আপনি একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এবং আপনার কাছে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে যে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান দুর্নীতিবাজ। সে মানুষদের প্রতারিত করছে, আপনি এটি পুরোপুরি প্রমাণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ইসলাম আপনাকে তা প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। আবার কতিপয় বিষয় রয়েছে যেগুলো প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ করা বৈধ নহে। যেমন, আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত আছি। আমি এর অনেক গোপন বিষয় প্রমাণসহ জানি। কিন্তু আমি এটা ইচ্ছে করলেই আমাদের প্রতিপক্ষের নিকট বলতে পারি না। সুতরাং এখানে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বৈধ নয়। যা দেশের মানুষের ক্ষতি করে, সরকারের বিপক্ষে চলে যায়। যদিও আমি এটা লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আমাদের বিরোধী বা শত্রুদের কাছে বিক্রি করে নিজ অধিক লাভবান হই। কারণ, আমার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। ইসলাম তা কোন প্রকার অনুমোদন করে না।

সুতরাং মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সেটি কোন ধরনের তথ্য বা মতামত তার উপর নির্ভর করে। আপনি যদি মনে করেন, আমি যে কাউকে অপবাদ দিব, আমি কারো বিরুদ্ধে কটুবাক্য প্রয়োগ করব এবং তারপর বলব এটা আমার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলাম এসব অনুমোদন করে না। আপনি যদি ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সালমান রুশদীর বইটি গভীরভাবে দেখেন তাহলে বুঝবেন একই বিষয় ঘটেছে। এ ব্যাপারে আমার মতামত হল আপনি সেই ভিডিও ক্যাসেটটিরও কথা বলতে পারেন যেখানে আমেরিকা থেকে একজন ব্যক্তি এসেছিল এবং তিনি মার্গারেট থেচার'স পলিসি সম্পর্কে চার বর্ণের একটি শব্দ বলেছিল এবং যখনি সে মার্গারেট থেচার-এর সম্পর্কে কিছু বলেছিল ইংল্যান্ড তাকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করেছিল। যদিও ইংল্যান্ড মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।

সুতরাং এই সালমান রুশদী, যাকে আমি ভালভাবে চিনি, সে পুনরায় ভুল করছে, সে আমাদের মহানবী (স)-কে কটাক্ষ করছে, আমাদের ব্যাপারে কটুবাক্য বলছে, সে কটুকথা বলছে এবং মারাত্মক ভুল করছে। সে সকল মানুষকে কটাক্ষ করেছে। হয়তো মানুষ তার বই পুরোপুরিভাবে অধ্যয়ন করেনি। যা সে বলেছে আমি সেগুলোও উল্লেখ করতে চাচ্ছি না। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় সে সৃষ্টিকে কটাক্ষ করেছে। আমি সেই শব্দটি ব্যবহার করতে চাচ্ছি না কারণ, সেটা একটি প্রতিহিংসা মূলক শব্দ। সে তাকে Magi (ম্যাগী) বলেছে, সে তাকে মহিলা কুকুর আখ্যায়িত করেছে। ইসলাম আপনাকে এসব বলার অনুমতি প্রদান করে না। আপনি কি তাকে 'মহিলা কুকুর' কি জন্যে বলছেন তা প্রমাণ করতে পারবেন? আমি সেই সব শব্দ প্রয়োগ করবো না যা তিনি প্রয়োগ

করেছেন। তিনি প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে Magi ম্যাগী বলেছেন যা Margarat Thatcher (মার্গারেট থ্যাচার) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। তার বইয়ে রয়েছে রাম এবং সীতাকেও কটাক্ষ করা হয়েছে যা ব্যক্তির জানা নেই।

আমি এটা বলতে চাই না ঠিক কি বিষয়ে রাম এবং সীতা সম্পর্কে লিখেছেন। আমি এজন্যই রাজীব গান্ধীকে স্বাগত জানাতে চাই। কারণ, তিনি পৃথিবীর মধ্যে প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি প্রথমেই তার বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমি এজন্যই তাকে ধন্যবাদ জানাই,, তিনি হয়তো জানেন না যে, এ বইয়ের মধ্যে রাম ও সীতাকে কীভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। হয়ত রাজীব গান্ধী জানতেন না সালমান রুশদী রাম ও সীতাকে কটাক্ষ করেছেন। আমি বইটি পড়েছি চিন্তা ভাবনা করেও দেখেছি এটা ভারতবর্ষে অবাঞ্ছিত করা উচিত। আমি খুব ভালোভাবে বইটি পড়েছি। সুতরাং যদি কেউ কাউকে এমনকি আপনার মা বা বোনকে কোনো প্রমাণ ব্যতীত কটুবাক্য বলে এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি এটি বাইবেলেও রয়েছে, আপনি যদি এটা পড়েন তাহলে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি এটি বাইবেলেও রয়েছে, আপনি যদি এটা পড়েন তাহলে দেখবেন Leviticus (লিভিটিকাস) বইয়ে বলা হচ্ছে "যদি কেউ ঈশ্বর বা ধর্মমতের প্রতি তীব্র কটাক্ষপূর্ণ কথা বলে তবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাকে পাথর মারো। সুতরাং যদি কেউ অন্যায়ের চরম সীমায় চলে যায় তবে আপনি তাকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করবেন। তাই যদি কেউ কোন প্রমাণ ব্যতীত, কোন কিছু ছাড়াই কাউকে কটাক্ষ করে, ইসলাম তাকে সে অনুমোদন দেয় না। এজন্যেই কেউ কেউ তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা কখনও কখনও জীবননাশের হুমকি দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ৪টি বিকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ'ও তার রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। সূরা মায়িদাহ; আয়াত ঃ ৩৩

চারটি পথ, হত্যা করা, শূলে চড়ানো, হাত পা কেটে দেয়া অথবা বহিষ্কার। দেখুন অত্যন্ত কঠিন শাস্তি, কিন্তু কেন? এর কারণ হল ইসলামে কোন অন্যায় সুবিধা উপভোগ করতে পারে না। কেউ যদি জিনা করে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার নিয়ম রয়েছে। অনেকে ভাবে এটা একটি বর্বরচিত আইন। অনেকে বলে আধুনিক বিজ্ঞানের এই যুগেও অর্থদণ্ড কেন? দেখুন সব ধর্মই ভালো কথা বলছে। হিন্দু ধর্ম বলছে "আপনি কোন মেয়েকে কটাক্ষ করবেন না, কোন নারীকে ধর্ষণ করবেন না। খ্রিষ্টান ধর্মও তাই বলছে ইসলাম ধর্মও।" ইসলামের ব্যতিক্রম হল আপনি কিভাবে এমন একটি রাষ্ট্র তৈরি করবেন যেখানে কেউ একজন নারীকে ধর্ষণ করবে না। যেকোনো পুরুষ যখন কোন মহিলার দিকে দৃষ্টি দিবে এবং তার মনে মন্দ কোন চিন্তা আসার আগেই যেন তিনি দৃষ্টি নামিয়ে নেন। যখন সে কোন নারীর দিকে তাকাবে কুরআন শরীফে বলছে, সে যেন তার দৃষ্টি সংযত করে। মহিলার ব্যাপারে এটাই পুরুষের 'হিজাব'। আর নারীরা অবশ্যই সমস্ত দেহ উত্তমভাবে ঢেকে রাখবে। কেবল দুটি অংশ খোলা থাকবে তা হল তার মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জির পূর্ব অংশ পর্যন্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যদি দুই জমজ বোন যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় এবং একজন ইসলামিক হিজাব পরিধান করে যা তার পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে, শুধু তার মুখ এবং কব্জির ওপর অংশ পর্যন্ত হাত ব্যতীত এবং অপর বোন যদি স্কার্ট এবং মিনি পোশাক পরিধান করে এবং যদি তারা সমান সুন্দরী হয় তাহলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বখাটে মাস্তান দ্বারা কে

কটাক্ষ শুনবে? অবশ্যই যে বালিকাটি স্কার্ট ও মিনি পোশাক পরিধান করেছে সে। পবিত্র কুরআনে মুসলমান নারীদের হিজাব পরতে নির্দেশ হল–

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ـ

অর্থাৎ, এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। সূরা আহযাব; আয়াত ঃ ৫৯

আমেরিকাতে প্রতি দিন ১৯০০ ধর্ষণের মামলা হয় এবং যদি কেউ ধর্ষণ করে তাহলে ইসলামের নির্দেশ হল তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। অনেকে এটিকে বর্বররচিত আখ্যায়িত করেন আমার প্রশ্ন হল, যদি কেউ আপনার বোন বা স্ত্রীকে ধর্ষণ শালীনতাহানি করে আর আপনি তার বিচারক হন; আপনি কি করবেন? তাদের অধিকাংশ বলেন, আমি ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড দেব। কেউ কেউ এমন আক্রমণাত্মক হয়ে যায় যে বলে তাকে পিটিয়ে হত্যা করবো। এখন আমার প্রশ্ন হল "যে আমেরিকায় প্রত্যেক দিন ১৯০০ ধর্ষণের মামলা হয়। সেখানে যদি শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং সব মহিলায় সমস্ত দেহ ঢেকে রাস্তায় বা ঘরের বাইরে চলাফেরা করে অপরদিকে পুরুষরা তাদের দৃষ্টি সংযত করে। তাহলে ধর্ষণের মাত্রা কি বাড়বে, কমবে, না অপরিবর্তিত থাকবে? এর ফলে অবশ্যই কমবে। এটাই একমাত্র কারণ সৌদি আরবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম ধর্ষণ হওয়ার দেশ। প্রত্যেক ধর্মই ভালো কথা বলে, আর ইসলাম আপনাকে ভালো কথা বলার সাথে সাথে পথ দেখায় কিভাবে সে ভালো অর্জন করতে হয়। এজন্যেই ইসলাম মিথ্যা অপবাদের স্থান নেই। কেউ আমার মা সম্পর্কে কটাক্ষ করতে পারবে না সেটি মুসলিম দেশ হোক আর অমুসলিম দেশ হোক। হ্যাঁ আমি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলব কিন্তু তা অবশ্যই মানবের কল্যাণের জন্যে হতে হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে–

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থাৎ, বলুন! সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। সূরা বনী ইসরাঈল; আয়াত ঃ ৮১

সাধারণত মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মানবের মঙ্গল বয়ে আনে তবে সেই মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলাম পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োগ করে। যদি তা মানবের অকল্যাণ বয়ে আনে তা ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না।

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে আপনি জানতে চেয়েছেন শিয়া এবং সুন্নীদের মধ্যে বিশ্বাসগত মত পার্থক্য ঠিক কোথায়? ভাই, পার্থক্যটি হল রাজনৈতিক ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে শিয়া এবং সুন্নীর মত আলাদা আলাদা ভাবে কোন উল্লেখ নেই। পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানে বর্ণিত আছে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

অর্থাৎ, আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। সূরা আলে ইমরান; আয়াত ঃ ১০৩

ইসলামে 'শিয়া', 'সুন্নী' মত বলতে কিছু নেই। এগুলো পরবর্তী পর্যায়ে এসেছে ইসলামের ভেতরে রাজনৈকি মত পার্থক্যের ভিত্তি ধরে। মুসলিম এক এবং একমাত্র। মুসলমানদের মধ্যে কোনো বিভাজন নেই। 'শিয়া', 'সুন্নী' বা অন্য যেকোন কিছুর মত। কারণ পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমের মাঝে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। [সূরা আনআম; আয়াত ঃ ১৫৯]

এর অর্থ হল ধর্মের বিভাজন বা খণ্ডকরণ ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। তাই 'শিয়া' এবং 'সুন্নী'দের মধ্যে যে পার্থক্য এটি কোন ধর্মীয় মতভেদ নেই। এটা এটি রাজনৈতিক পার্থক্য। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের সদুত্তোর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম বালাচন্দন, আমি মুম্বাই শহরের একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কর্মরত। ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে আমার প্রশ্ন, যে রকম বর্তমান পৃথিবী ধারণা করে যে, ভারতীয় মুসলিমদের ২টি পরিচয় রয়েছে। একটি হল ধর্মীয় পরিচয় যা তা হল মুসলমান হওয়ার কারণে, এবং অন্য পরিচয় হল বিধিসম্মত/আইন পরিচয়, যা মূলত "হিন্দু উপাদান" দ্বারা গঠিত, এবং এ ব্যাপারে মুসলমানদের মনে বিশেষত তাদের মধ্যে কতিপয় মুসলমানদের মনে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। আমার কিছু বন্ধু আছে তাদেরকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখি তাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যা স্বভাবগতভাবেই হিন্দু আদর্শের মনে হয়। তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে রাশিফল নিয়ে জ্যোতিষ চর্চা করে। মুসলমান বন্ধু, মানুষ যাদের এখানে কি কোন দ্বন্দ্ব থাকার কথা ছিল– এই দ্বন্দ্ব কি চলতে থাকবে? কুরআন এ ব্যাপারে কি বলে? আপনি কি তাদের এই বলে চালিয়ে দিবেন যে, তারা আপনার চেয়ে কম ধর্মীয় অনুভূতিসম্পন্ন মুসলিম। আমি আশা করব এ বিষয়ের ওপর দৃষ্টি দিবেন।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন, ভারতীয় মুসলিমদের সম্পর্কে। এটি এমনই এক প্রশ্ন যা পৃথিবীর যে কোনো এলাকার যে কোনো মুসলমানদের ব্যাপারে করা যেতে পারে যে, যদি তুমি একজন মুসলিম হও তবে তুমি কি অপর ধর্মের, অপর জাতির, অপর সম্প্রদায়ের, অপর সংস্কৃতির কোনো বিষয়কে অনুসরণ করতে পার হোক সেটি ভারত বা আমেরিকা বা ইউরোপের যে কোনো একটি দেশ। মূলত 'মুসলিম' এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার সকল আকাঙ্খা বিসর্জন দেয়। আমরা ভারতীয় বা আমেরিকান বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করতে পারব, যদি তা ইসলামের মূলনীতির বিরোধী না হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে "মানুষ প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করে একজন মুসলিম মহিলা কি শাড়ি পরিধান করতে পারবে। যেহেতু এটি ভারতীয় সংস্কৃতি? উত্তর হলো– হ্যাঁ, তিনি পরিধান করতে পারবেন, যদি তিনি পাঁচটি জিনিস মেনে চলেন। ইসলামে পর্দার ক্ষেত্রে এই পাঁচটি বিষয় হল–

১. তার মুখ এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত ব্যতীত বাকি শরীর আবৃত থাকতে হবে।

২. যে কাপড় সে পরিধান করবে সেটি অবশ্যই ঢিলা-ঢালা হতে হবে, টাইট হওয়া যাবে না যাতে এটি দেহের ভাঁজকে প্রকাশ করে।

৩. এটি এমন স্বচ্ছ হওয়া যাবে না যাতে পরিধেয় বস্ত্র ভেদ করে দেহের অংশ দেখা যায়।

৪. এটি এতটা আকর্ষণীয় হওয়া যাবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করে।

৫. এই কাপড়টি বিপরীত লিঙ্গের সদৃশ হওয়া যাবে না।

এখন যদি আপনি শাড়ি পরতে চান তবে ইসলামি পদ্ধতি হলো– যেটি আপনি মস্তক আবৃত সেটি যাতে আপনার মস্তক আবৃত পারে, যাতে আপনার মাথার চুল দৃষ্টি গোচর না যায় এমনকি পেট দেখা না যায় সাথে সাথে দেহের অন্য কোন অংশও যাতে দেখা না যায়। যদি আপনি এটি অনুসরণ করতে পারেন, তবে আপনি ভারতীয় সংস্কৃতি অনুকরণ করতে পারেন, কোনো আইন অমান্য করা ব্যতীত। কিন্তু যদি আপনি বলেন, আমি এমনভাবে শাড়ি পরিধান করবো যাতে কোন ব্লাউজ থাকবে না এবং দেহের অংশ দেখা যাবে, তবে এক্ষেত্রে ইসলাম শাড়ি পরিধান করার স্বীকৃতি দেয় না। একইভাবে আপনি যদি আমেরিকাতে বলেন, যে আমি স্কার্ট বা মিনি স্কার্ট পরতে চাই, সেক্ষেত্রেও ইসলাম স্বীকৃতি দেবে না। সুতরাং আপনি ইসলামের শিক্ষার বিপরীতে না গিয়ে অন্য যেকোন সংস্কৃতির অনুসরণ করতে পারবেন, ইসলামে এক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ নেই। কারণ আমাদের জন্য আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত আদর্শ বেশি গুরুত্বর্পূণ, কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের জাতিকে সার্বিক সহায়তা করতে হবে, তবে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং লালন পালন করছেন তিনি হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। সুতরাং আমাদেরকে তার কৃতজ্ঞতাপাশেই অধিকারবদ্ধ থাকা উচিত, বিশ্বের অন্য যে কারো চেয়ে যেকোন সরকারের চেয়ে। তবে আমাদেরকে অবশ্যই মানবজাতিকে সম্মান করতে হবে। যদি ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী না হয় তবে আপনি এ ধরনের সংস্কৃতি অনুসরণ করতে পারবেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে আপনি বলেছেন, আমরা কি ভাগ্য সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি? এ ব্যাপারে আল-কুরআনের সূরা মায়িদায় বর্ণিত আছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَـٰمُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَـٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ـ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারণী তীর এগুলো অত্যন্ত গর্হিত শয়তানি কাজ সুতরাং তোমরা এটি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক, তবেই তোমাদের কল্যাণ হবে। - সূরা মায়িদা ঃ ৯০

আমি বলছি না যে কোন ব্যক্তি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে পারে বা পারে না– অধিকাংশ ব্যক্তি যারা বলে, তারা ভবিষ্যৎ বাণী করতে সক্ষম, তারা একটু বাড়িয়েই বলছে। কুরআন এ ধরনের কথা বলেনি যে, কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে। তবে কিছু মানুষ এমন থাকতে পারে যারা এই বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে। কিন্তু প্রতিটি মানুষ যারা সেসব ব্যক্তিদের কাছে যায়, তারা সবাই বলে যে আমি যার কাছে গিয়েছি, তিনি একজন ভালো জ্যোতিষী। আসলে তাদের প্রায়ই প্রতারিত হন। ঐ সমস্ত জ্যোতিষীর কাছে কম্পিউটার থাকে, সেখানে আপনি আপনার বয়স প্রবেশ করাবেন, আপনি জবাব পেয়ে যাবেন। এ ব্যাপারে আমেরিকাতে এক জরিপ হয়েছিল সেখানে মনোবিজ্ঞানের এক প্রফেসর তার ক্লাসের ১০০ ছাত্রকে নিয়ে এক সপ্তাহ যাবত গবেষণা করলেন। সপ্তাহ খানিকের ভেতর তিনি বললেন, আমি তোমাদের স্বভাব এক একটি চিরকুটে লিখে দিতে পারি। তারপর তিনি তাই করলেন এবং প্রত্যেকের হাতে তাদের চিরকুট দিলেন। তিনি এবার তাদেরকে বললেন, সবাই একসাথে চিরকুট খোল এবং তোমাদের মতামত বল আমার ধারণা কি সত্য না মিথ্যা।

প্রফেসর নিজে লিখলেন যেমন ছাত্র A এবং তার ব্যক্তিগত স্বভাব ও তার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। এভাবে প্রত্যেককে তিনি একটি চিরকুট দিলেন। তারপর প্রফেসর বললেন, এখন চিরকুট খোল এবং পড়" সাথে সাথে

সবাই চিরকুট খুলে পড়ে দেখল এবং তাদের ভেতর প্রায় ৯০-৯২ শতাংশই বলল যে "প্রফেসর ১০০% সঠিক। বাকি ৮-৯% বললেন প্রফসর ৯৫% সঠিক। এবার প্রফেসর বললেন, "আমি সবার জন্য একই কথা লিখেছি।" সুতরাং আমি যদি বলি "আগামী একমাসের মধ্যে আপনার জন্য দুঃসংবাদ আছে" যদিও সেখানে সহস্রাধিক উত্তম জিনিস থাকে তন্মধ্যে দুই-একটি মন্দ সংবাদ তো থাকা স্বাভাবিক। আর আমি যদি বলি "গত বছরে আপনার ভাল কোন ঘটনা ঘটেছিল যদিও সেখানে সহস্রাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল তন্মধ্যে সে সময় দু-একটি উত্তম ঘটনা তো ঘটা সম্ভব।"

এসব অস্পষ্ট বক্তব্য, যেগুলো সর্বদাই সঠিক হয়ে থাকে। সুতরাং যখন আপনি পত্রিকায় দেখেন যে আজ তুলা রাশির এই এই হবে, সিংহ রাশির এই এই হবে। এগুলো সকল মানুষের মধ্যে কেবল এক ধরনের উত্তেজনাই সৃষ্টি করে। সুতরাং আল- কুরআন বলেছে "প্রশ্রয় দিয়ো না" এমন কিছু ব্যক্তি থাকতে পারে যারা বিশেষজ্ঞ আমি বলছি 'না'। বরং কুরআন বলে যে "যদি তুমি এমন তথ্য জান যা তোমার জানা উচিত নয়" এটি কিভাবে মানুষের জন্য ক্ষতিকর ? কুরআন এ প্রসঙ্গে বলেছে, "ভবিষ্যদ্বাণী করা থেকে দূরে থাক; কিন্তু কেন ? কারণ যা তোমার জানা উচিত নয়, এখন এটি তোমার লোকসানের কারণ হবে যদি তুমি এটি জানার চেষ্টা কর। যেমন, যদি আপনি জ্যোতিষির নিকট যান এবং সে যদি বলে "আপনি কোন একটি ব্যাপারে অকৃতকার্য হয়ে যাচ্ছেন।" এই লোকটি বা ছেলেটি সর্বদা আগে শ্রেণীকক্ষে আসে, যেহেতু জ্যোতিষি বলেছে 'তুমি অকৃতকার্য হবে' তাই সে পড়াশুনা ছেড়ে দিল এবং সে অকৃতার্য হল। এবার ভেবে দেখুন সে কাকে দোষারোপ করবে?......সে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে দোষারোপ করবে। দেখুন জ্যোতিষিটি কি সমস্যা সৃষ্টি করল। এখন দেখা যাবে যে জ্যোতিষির কথা সত্যি হবে, কিন্তু কেন? কেননা জ্যোতিষির ওপর লোকটি অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু লোকটি যদি তার কথা বিশ্বাস না করে পড়াশুনা করত তবে সে কৃতকার্য হত। সেজন্যই ইসলাম বলেছে, কুরআন বলেছে,, "ভবিষ্যৎবাণী করাকে কর্ণপাত করো না।" যদি কোন মুসলমান এ কাজটি করে তবে সে নিশ্চিতভাবেই কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করল– সে অবশ্যই প্রকৃত মুসলিম নয়, সে ইসলামের এই নীতি পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করল না, ইসলামের অন্য সব নীতি হয়তো সে পালন করে থাকতে পারে।

প্রশ্ন ঃ 'ইসলাম' ও 'হিন্দুত্ববাদ' আদর্শের মধ্যে পার্থক্য কী কী? পবিত্র কুরআন বলেছে, "আল্লাহই প্রথম এবং তিনিই শেষ।" হিন্দু উপনিষদগুলো বলে, "আল্লাহ এক.---তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আপনার মন্তব্য কী?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাইজান, খুব উত্তম প্রশ্ন করেছেন যে, 'ইসলাম'. এবং 'হিন্দুত্ববাদ'-এর মধ্যে মিল কী কী? এবং তাদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য কতটুকু? আমি নিজে পড়েছি হিন্দু উপনিষদগুলো বলে, 'আল্লাহ এক...... তিনি সর্বত্র উপস্থিত'। পবিত্র কুরআনও বলেছে, "তিনিই শুরু তিনিই শেষ"। কিন্তু আপনি যদি এ দু আদর্শের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে চান তবে আপনি একজন হিন্দুকে জিজ্ঞেস করুন "আপনি কয়জন দেবতাকে পূজা দেন?" কেউ হয়তো বলবে তিনজন, কেউ বলবে দশজন, কেউ হয়ত বলবে একশো জন, আবার কেউ বলবে তেত্রিশ কোটি দেবতা। কিন্তু যদি আপনি একজন শিক্ষিত হিন্দুকে প্রশ্ন করেন যেমন কোন আইনজীবী যিনি সাধারণত খুব জ্ঞানী হন তাদের ধর্মগ্রন্থে যে "হিন্দুরা কয়জন দেবতাকে পূজা করে?" তারা আপনাকে বলবে 'একজন'–কিন্তু তারা বিশ্বাস করে 'এনথ্রোপোসরফিজম' নামক দর্শনতত্ত্বে যার অর্থ 'দেবতা